দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৯৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৩ ...

যদি-নির্ভর শিক্ষাদীক্ষা

042

দেশের চারটি বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফল গেলো শুক্রবার বেরিয়েছে। পরীক্ষায় পাসের গড় হার ৫১ দশমিক ৪১। চারটি বোর্ড থেকে মোট ১ লাখ ৮০ হাজার ২শ ২৭ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। এর মধ্যে পাস করেছে ৯২ হাজার ৬শ ৭০ জন। অর্থাৎ ৮৭ হাজার ৫শ ৫৭ জন পরীক্ষার্থী পাস করতে পারেনি।

চর্বিত চর্বণের মতোন সেই একই জিজ্ঞাসা আবার তুলতে হয়। যতো সহজে এখন ফলাফল লেখা যাচ্ছে, ততো সহজে ফলাফল জানা যায়নি। পত্রিকায় ফলাফল প্রকাশিত হচ্ছে এমন সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর যথারীতি ছাত্র-অভিভাবকদের হয়রানি স্বাভাবিক ছিল। আশা করা গিয়েছিল প্রতিটি কলেজে ফলাফল পৌঁছে যাবে। মাত্র তিন বছর আগ পর্যন্ত পাঠানো হয়েছেও। কিন্তু কি কারণে এ পাট এখন চুকে গেছে—কোথাও বই যায়, কোথাও নয়। এর ফলে পরীক্ষার্থীদের নাকানি-চুবানি খেতে হয়, নির্ভর করতে হয় অন্যের দয়া, অনুকম্পা, সৌজন্য, সহযোগিতার উপর। অথচ গুনে গুনে পাঁচটি পরীক্ষার্থী বোর্ডের পরীক্ষার রকমারি ফিস দিয়েছে। যা দাবী করেছে বোর্ড, তা পালন করেছে মিটিয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল জানার অধিকার কি তাহলে ন্যায্য নয়? পরীক্ষা দিয়ে তার ভালো-মন্দ জানার এখতিয়ার কি পরীক্ষার্থীর বা তার অভিভাবকের নেই? এ প্রশ্নটি জনমনে দেখা দিয়েছে তীব্রভাবে। হন্যে হয়ে পড়ে পরীক্ষার ফলাফল জানার জন্য আর কতো বোর্ডের দরোজায় ধর্না দিতে হবে, নাজেহাল হতে হবে কেন। উৎকণ্ঠিত পরীক্ষার্থীর দেয়ালে উঠে অধীর প্রতীক্ষার ছবি কাল পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এ ছবি দেখে অনেকের মনে জিজ্ঞাসা জেগেছে—পারো তিন মাস লাগে যেখানে ফলাফল তৈরিতে, সেখানে কি ক্ষতি হয় আর দশদিন দেরি করে বই ছাপিয়ে প্রতি কলেজে পাঠালে। ফলাফলের বই ছাপিয়ে বিক্রির কথা ভেবেছেন অনেকে, ভাবনা পত্রিকায় ও পত্রিকায় হয়েছে কিন্তু আমাদের তারই বা কি দরকার ... ফলাফলে প্রত্যাশিত কাংক্ষিত। কিন্তু ... ফসকা গেরো ... গেছে ফলাফল আগেই ফল জানা ... মিষ্টি বিতরণ ... এর পরিণামটি ভয়ংকর ...। যারা জানলো না, ... উদ্বেগ চরমে ওঠে। এমনিতেই পুরো পরীক্ষার ব্যাপারটি এমনি ভাগ্যনির্ভর যে অনেক পরীক্ষার্থী আত্মবিশ্বাস হারিয়ে অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ে। নিজের যোগ্যতা ও উত্তরপত্রে লেখা সব ছাপিয়ে তার মনে অনিশ্চয়তা বাসা বাঁধে। এ শূন্যতা তাকে কুরে কুরে খায় দীর্ঘ তিনটি মাস। শেষ পর্যায়ে তার ধৈর্যবৈকল্য ঘটে। এখন যদি দেখে কেউ কেউ জেনে গেছে, শুধু সেই জানছে না, স্বাভাবিকভাবেই তার মানসিক যন্ত্রণা ঘটে। এ সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে শিক্ষাবোর্ড থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হয়েছে—আগাম ফলাফল প্রকাশের দায়দায়িত্ব টেবুলেটরদের। ছক-বিন্যাসকেরাই ঐ অসাধু কাজটি করেছেন। এই জবাবও পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এ সম্পর্কে টেবুলেটরদের কোনও বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি। যদি আদপেই না-পাওয়া যায়, ধরে নিতে হবে বোর্ডের বক্তব্য অসত্য নয়। যেহেতু ছকবিন্যাসকেরা কোনও না কোন কলেজের শিক্ষক এবং সেহেতু এর কার্যকারণ সম্পর্কে তারা সচেতন, সেহেতু এমন অভিযোগ সত্য হলে তাঁদের প্রশংসা করার অবকাশ থাকে না। পরীক্ষার শুরু থেকে শেষ অবধি পদ্ধতিটি-ই এমন। গোলমালে ও দীর্ঘসূত্রতায় সে এজন্য কোনও এক স্তরে কেউ নিয়ম ভঙ্গ করলে পুরো কাঠামো নড়বড়ে হয়ে যেতে বাধ্য। তা হচ্ছেও। তার ফলে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকেরা মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়েছে।

এই দরিদ্র দেশে শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। শিক্ষার উপকরণ থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা লাভ পর্যন্ত যে খরচ করতে হয়, তা বর্ণনা অল্প কথায় সম্ভব নয়। পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, পারিবারিক পর্যায়ে আর্থিক অসঙ্গতি, ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনার অবর্তমানতা ও অনিশ্চয়তা, মেধা তালিকাভুক্ত বাছাই, প্রবণতার (এ্যাপটিচুড) বাছাইয়ের অনুপস্থিতি—সব মিলে এ সমাজে সবচেয়ে অনিশ্চিত হচ্ছে শিক্ষা। যে ক্ষীণসংখ্যক শিক্ষা লাভের সুযোগপ্রাপ্ত, তাদের জন্যও ব্যবস্থার গুণে পথ মসৃণ নয়। যে সংখ্যক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়, তাদের কতো পার্সেন্ট সফল হবে, তার কোনও বিধি-কল্পনা নেই। ব্যর্থদের জন্যও বা কি বার্তা? শুধুই কি যথেষ্ট পরবর্তী সিলেবাসে বার-বার পরীক্ষা দেয়ার কনসেসন দিতে-থাকা?

যারা আজ কৃতকার্য, তাদের মধ্যেও ছায়া, ভবিষ্যৎ কোথায় নেবে বলা তো যায় না। কোনও উত্তীর্ণ ছাত্রই বলতে পারছে না, 'এই আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা'। আগামী জীবন সম্পর্কে কৃতী ছাত্ররা ইচ্ছা প্রকাশ করছে মাত্র। এই ব্যক্ত অভিলাষে মিশ্রিত আছে 'যদি' অর্থাৎ সংশয় অর্থাৎ যদি এই না হয়। সেরা ছাত্রদের এই অনিশ্চয়তাবোধ প্রমাণ করে—ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় না এমনকি কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেও না। যতোই কৃতিত্ব যোগ হোক তার ফলাফলে, পুরস্কারের ডালি তার জন্য উজাড় করা নয়। লক্ষ্য অর্জনে তার সামনে এখনও বহু প্রতিবন্ধকতা। এ প্রতিবন্ধকতার নাম প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা মানে আবার পরীক্ষা, ভর্তি পরীক্ষা। এইসব ভর্তি-পরীক্ষায় নম্বর প্রাপ্তিই যোগ্যতা নির্ণয় করে না, যোগ্যতা নিরূপিত হয় নির্দিষ্ট সংখ্যক সীটের মধ্যে তালিকায় স্থান পাওয়ায়।

একথা সত্য, সীট সংখ্যা অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঘোষণা হয়। অর্থাৎ কাপড় অনুযায়ী কোট তৈরি হয়—দেহ অনুযায়ী কোট নয়। ফলাফল বিপুল সংখ্যক ছাত্রের অন্ধকারে হাত পা ছোঁড়া, এটা না হলে ওটা, ওটা না হলে এটা। এর নাম উচ্চ শিক্ষা। এ শিক্ষা কজনে পায়? এমন অগত্যা শিক্ষা নিয়ে কি লাভ হয়? লাভ হয় না। যোগ্যতা, উদ্যম, উৎসাহ, আগ্রহ, প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও আমরা চিকিৎসক, কারিগরি থেকে আরম্ভ করে বিজ্ঞান বা সাহিত্যের উচ্চতর ক্ষেত্রে সকলকে ঠাঁই করতে পারি না। অথচ এমন নয় যে এদেশে সব বিশারদ ও পন্ডিত উপচে পড়ছে এদের আর প্রয়োজন নেই। জনসংখ্যা অনুপাতে চিকিৎসক নেই, নেই প্রয়োজনানুগ কারিগর, শিক্ষক, গবেষক। ধারদেনা করে বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ বা বিশারদ আনতে পর্যন্ত হয় মোটা টাকায়—অথচ দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের ঘটে মেধার, সামর্থ্যের ও অর্থের অপচয়।

লুকোনো ছাপানো বিষয় নয়, এসবই উচ্চারিত, বহুল উচ্চারিত। কিন্তু তবু প্রতি বছর একই চিত্র। প্রচুর অধ্যবসায় ও অর্থ ব্যয়ে পরীক্ষা দেয়া, প্রচুর শ্রম আর উৎকণ্ঠায় যে পরীক্ষার ফলাফল অবহিত হওয়া, এরপরেও শব্দ বিন্দু জমে ললাটে: অতঃপর কি হবে? ছেলেকে কোথায় ভর্তি করানো যাবে? এই চিন্তায় রাতের ঘুম হারাম হয়, দিনের কাজ থেমে যায়, শংকিত মানে মানুষ তাবিজ মাদুলিও আশ্রয়ী হয়। অবশেষে একদিন বিজ্ঞানের সাধ নিয়ে বাণিজ্যে সীট পাওয়া যায়। বাণিজ্যের প্রার্থনা ব্যর্থ হয়ে সাহিত্যে জায়গা হয়, কারিগরির প্রার্থী চিকিৎসা বিজ্ঞানে যায়, চিকিৎসার স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে সাধারণ কলেজে ভর্তি হতে হয়। এমনি করে শেষ অবধি শিক্ষার চৌকাঠ টপকানো হয়—কিন্তু অপূর্ণতা জীবনকে বিষিয়ে দেয়।

কালক্ষেপণ সাম্প্রতিককালের হৃদয়বিদারক সংযোজন। প্রবাদের 'আটটার গাড়ি কটায় ছাড়ে'র মতোন এখন অমুক সালের পরীক্ষা কতো সালে হয়—এমন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। আবেদনে দেখা যায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল এক বছর, অনুষ্ঠিত হয়েছে আরেক বছর, ফলাফল আরেক বছর—এমন করে প্রার্থীকে বিশদ বর্ণনায় তথ্যাবলী বোঝাতে হয়। উচ্চ শিক্ষায় এই সময়ের অপচয় সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতির ওপর চরম আঘাত। ব্যক্তি পর্যায়ে পরিবারগুলো চরম সংকটের মুখোমুখি হয়। জমি বিক্রি বা গহনা বন্ধকের অর্থ অনির্দিষ্টকাল ধরে যেমন খরচ করা যায় না। তেমনি জীবনের মূল্যবান বছরগুলোর এমন অপচয়ের ক্ষতিপূরণ হয় না।

এইচএসসি পাসের পর থেকেই আরম্ভ হয় এই অনিশ্চয়তা। যাদের তিলমাত্র সামর্থ আছে, তারা সন্তানকে পাঠ গ্রহণের জন্য দেশে রাখেন না। এমন করে ক্রমবর্ধমান সংকট ও সমস্যা শিক্ষাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে—শিকেয় তোলা এ পদার্থটি কালগুণে মাচায় উঠে আরও মহার্ঘ হয়ে পড়েছে।

এ নিয়ে যে সংশ্লিষ্টগণ ভাবলেশহীন, তা কিন্তু নয়। শিক্ষা নিয়ে বিস্তর কথাবার্তা হচ্ছে, হয়। কিন্তু কাজ তো হয় না।

সামাজিক, অর্থনৈতিক জনসংখ্যাভিত্তিক যতো সমস্যা আছে, তার স্বার্থক নিরসন মন্তব্য সময়োপযোগী, সচল, সুদূর প্রসারী, সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বজনলভ্য শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে। কিন্তু সে শিক্ষা পদ্ধতি আর গড়ে উঠল কোথায়?

গতকালের খবরের কাগজেই বেরিয়েছে যশোরে এক ব্যর্থ পরীক্ষার্থী আত্মহনন করেছে। এমন আত্মহনন অন্তর্জগতে গভীর রক্ত ক্ষরণের ফল। যে শিক্ষার ধর্ম আলোকিত করার প্রয়োগ, পদ্ধতি ও পরিকল্পনার অভাবে, তা আজ পথ দেখাতে পারছে না। মনে হয় কানাগলির শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। এই অচলাবস্থা থেকে উদ্ধারের পথ কি?

—হোসনে আরা শাহেদ